যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ জুলাই ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

ঝড় মানেই একটা অন্যরকম ব্যাপার। প্রচণ্ড হাওয়ার দাপট, আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি। ঝড় মানেই একটা অদ্ভুত ভয়, ভালোলাগা। ঝড়ের দেখা পাওয়া এখন শহরবাসীর কাছে প্রায় অনিশ্চিত হয়ে উঠলেও বর্তমানে ‘জিএসটি’ ঝড়ের দাপটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিশেহারা। রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের কাছে ‘ঝড়’ কতটা নস্টালজিয়ার, তা কেউ হলফ করে বলতে না পারলেও সাধারণ মানুষ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে জানেন। তাই তো ফোটোফ্রেমে বাঁধানো ‘ঝড়’-এর ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়ে নস্টালজিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছেন...

ফোটো: **সৌম্যকান্তি মণ্ডল** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত (সংগীতশিল্পী)

কলকাতা কলকাতাই। আমি ভীষণ ভালোবাসি কলকাতাকে। সেই ভালোবাসাটা উসকে ওঠে কলকাতা ছেড়ে অনেক দিন দূরে থাকার পর, বাইরে থেকে ফিরি আর প্লেন যখন কলকাতা এয়ারপোর্টের মাটি ছোঁয়। সে এক অন্যরকম তৃপ্তি। যেন মনে হয় মায়ের কোলে এসে পড়লাম। প্রত্যেকটা জায়গারই আলাদা গুরুত্ব, আলাদা সম্মান নিয়ে বেড়ে ওঠে তবে আমাদের কলকাতার বইপাড়া, নন্দন চত্বর এখানকার শিল্প-সংস্কৃতির বাতাবরণটাই অন্যরকম। আমি ভারতের বিভিন্ন শহরে গেছি তবে আমার মনে হয় আমরা যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি তার চার্মটাই আলাদা। আর এখানে এত রকমের বৈচিত্র ভাবা যায় না! এই সিনেমা হল, এই নাটক দেখার জায়গা, এই অ্যাকাডেমির পাশে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম সেখানে গেলে আমি তারা দেখতে পাচ্ছি আবার তার পাশের বাড়িতে ঢুকলে আমি কলকাতার মঞ্চের তারকাদের দেখতে পাচ্ছি। আবার দু’পা এগোলে নন্দনে সিনেমার তারাদের দেখতে পাচ্ছি, আবার আর একটু গেলে রবীন্দ্রসদনে গান-বাজনার এক অন্যরকম মহল— এত কিছুর সমাহার ছোট্ট একটু জায়গাতেই। এখানের সংস্কৃতির মেলবন্ধনটাই আলাদা। কলকাতা মানেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। কলকাতা এখন আরও নতুনভাবে সেজে উঠছে।

অনেকে বলেন পুরোনো কলকাতা অনেক ভালো ছিল, আমি বলব পুরোনো কলকাতা তো ভালো লাগতই নতুন কলকাতা আমার আরও বেশি ভালো লাগে। অন্যান্য শহরের মত আমাদের শহরেও এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে অনেক সমস্যাই আছে। সরকারের কাঁধে আমরা সব দায়ভার ছেড়ে দিয়ে সব ব্যাপারে দোষারোপ করলেই তো হল না, আমাদেরও অনেক দায়িত্ব আছে শহরটাকে ভালো রাখার। কলকাতায় যেমন দেখি কেউ গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তার ওপর নোংরা ফেলে চলে গেল। এটা তো আমাদের নিজেদের সমস্যা। নিজেদের শিক্ষার সমস্যা। হয়তো রাস্তায় জল জমে, নালা কেটে বা যে কোনও উপায়ে হয়তো বা সেটাকে ঠিক করা যেতে পারে। তবে চেতনা তো ওইভাবে বদলানো সম্ভব না। কলকাতার মানুষ অনেকেই মুখে বলে কলকাতাকে ভালোবাসি *এরপর পরের পাতায়*

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

অনেক লোককেই আমরা ভুল বুঝি

প্রিয়ম দত্তগুপ্ত

ট্রেন মানেই আমাদের মতো ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের কাছে এক অদ্ভুত জগৎ। কত রকমের মানুষ কত বিচিত্র তাদের আলাপ-ব্যবহার, রুচিবোধ। কিছু কিছু লোককে দেখি যারা নিজেদের নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকে, চারপাশে কী হচ্ছে সেদিকে তাদের হুঁশই থাকে না। রমেনদা, শ্রীকান্ত, অনিল আর দত্তদা খানিকটা এমনই। ছ’টা চব্বিশের শিয়ালদহ-বজবজ লোকালের পাঁচ নম্বর কম্পার্টমেন্টের শেষ গেটের জানালার ধারের চারটে সিট সারা বছর যেন এদের রিজার্ভড। ট্রেনে যতই ভিড় হোক তাতে ওদের কিছু যায়-আসে না। সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে, কে কার ঘাড়ের ওপর পড়ল এসব নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। নিজেদের গলির ভেতরেও কাউকে ঢুকতে দিতে চায় না। ভুল করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর পা যদি ওদের পায়ে লেগেছে তাহলেই হয়েছে। বাপ-বাপান্ত করে ছাড়বে।

ওরা ডুবে থাকে তাসে। টোয়েন্টি নাইনের সতেরো, আঠারো, উনিশ, ডাবল ডাকের সাথে তাদের ডাবল চিৎকারে নতুন যাত্রীদের কান পাতা দায় হয় ট্রেন কম্পার্টমেন্টে। তার সাথে চলে কথায় কথায় ঝগড়া। অসন্তুষ্ট হলেও কারওর কিছুই বলার থাকে না। তবে বললেই-বা কি? তাতে ওদের কারওরই খুব একটা কিছু যায়-আসে না। বললেই ঝগড়া, দাদাগিরি। এতদিন ধরে একই ট্রেনে যেতে যেতে হয়তো ট্রেনটাকে নিজের বাড়িই মনে করে। যতদিন ধরে একসাথে যাচ্ছি এটাই দেখে আসছি। ট্রেনে উঠে জানালার ধারে চারটে সিট দখল করে তাস খেলতে খেলতে আর ঝগড়া করতে করতে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু মাঝেরহাট থেকে বয়স্ক লোকটা এই বাদুড়ঝোলা ট্রেনে উঠে কোনওরকমে ভেতরে ঢুকেই যখন হঠাৎ বমি করতে শুরু করল; তখন অনেকেই বিরক্ত হল, কেউ

গালাগালও দিল বয়স্ক লোকটাকে। কেউ শুধুই নিজের সিটে বসে দেখল, আবার কেউ সহানুভূতি সহকারে জলের বোতলটা এগিয়ে দেবে দেবে ভাবছে। তবে দেওয়া আর হয়ে উঠছে না, উঠে গিয়ে নিজের সিটটা দেওয়া তো দূরে থাক। কিন্তু রমেনদা হঠাৎ, ‘এখানে বসুন’ বলে নিজের সিটটা যখন ছেড়ে দিল তখন আমরা অবাক হয়ে দেখলাম। যে-লোকটা শুধুমাত্র ট্রেনে বসে তাস খেলতে খেলতে যাবে বলে লোকের সাথে ঝগড়া করে, স্বেচ্ছায় সে তার নিজের সিট ছেড়ে দিল! কী হল আজ রমেনদার!

রমেনদাকে দেখে আজ মনে হল সত্যিই বাইরে থেকে দেখে অনেক লোককেই আমরা কত ভুল বুঝি। মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটা হলেও হয়তো সবার ভেতরেই থাকে। সেটা ঠিক সময় না হলে বোঝা যায় না।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১৭ জুলাই ২০১৭

প্রথম পাতার পর

অথচ রাস্তার ওপর দিয়ে বা ওভারব্রিজ দিয়ে যেতে যেতে প্লাস্টিক ছুঁড়ে ফেলল। কলকাতার অনেক জায়গাতেই কিন্তু এখনও বৃষ্টি হলে জল জমে যায়, এতে অনেক মানুষেরই জীবনযাপনে খুবই সমস্যা হয়। হয়তো দু'দিন অফিসও ছুটি নিতে হয়। তারপর আশপাশে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিও তৈরি হয়। বর্ষাটাকে উপভোগ করার কথা তো ছেড়েই দিলাম। তাই এই ব্যাপারটার একটু সুরাহা হওয়া দরকার।

মেঘে ঢাকা মঞ্চ

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

সকালবেলা থেকে কড়কড় করে বাজ পড়ছে। মেঘ গর্জন করছে আকাশ কালো করে। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে; যেন গোটা পৃথিবীটাকে ডুবিয়ে দেবে। স্কুল-কলেজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। রাস্তায় জল জমেছে একটু একটু। এক্কাগাড়ির ঘোড়া দুটি অঝোরে ভিজছিল বলে একটা ছাউনির নিচে গাড়িটাকে নিয়ে যেতে বললেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

আজ তাঁর নতুন নাটক 'সরোজিনী'র মহড়া বসবে চিৎপুরের গোলাপসুন্দরীর ঘরে। কিন্তু তিনি এই দুর্যোগে সেখানে পৌঁছবেন কী করে। বৃষ্টিতে বড্ড ভিজে গিয়েছে ঘোড়াগুলো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খুব মায়া হল। তাঁর মনে হল মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবে সেইজন্যে ঘোড়া কেন রোদে পুড়ে, জলে ভিজে সেই গাড়ি টানবে?

সাধারণ চিন্তা-ভাবনার মানুষ তো আর নন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই কৃতি সন্তানটি তাঁর কর্মক্ষমতায়, চিন্তা-ভাবনায়, রূপে-গুণে, স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ঠাকুর পরিবারকেও আরও উজ্জ্বল করছে।

ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি বাণিজ্য করতে পারেন আবার লিখতে পারেন দুরন্ত কত গান। কত অনন্য নাটক। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সে কোনও তর্কালঙ্কার বিদ্যাবাগীশের থেকে কম যান না।

কিন্তু আজ এই বৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্র কী করবেন? জ্যোতিরিন্দ্র কোচওয়ানকে বললেন, যতক্ষণ বৃষ্টি পড়ছে ততক্ষণ এই টিনের নীচে দাঁড়িয়ে থাকো হে আবদুল ভাই। তারপর বৃষ্টি থামলে ঘোড়াদের নিয়ে ফিরে যেও জোড়াসাঁকোয়। ওদের খেতে দিও। তুমি বিশ্রাম নিও। আমার আজ গাড়ি লাগবে না আর।

জ্যোতিরিন্দ্র বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। তুমুল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তিনি হাঁটতে লাগলেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ধরে। তাঁর ফিনফিনে চাদর পাঞ্জাবি ভিজে একসা। মনে হচ্ছে যেন কোনও গ্রিক দেবতা বৃষ্টি পড়বার আনন্দে হেঁটে চলেছেন শহরের রাস্তা ধরে।

গোলাপসুন্দরীর ঘর এখান থেকে বহুদূরে। বেশ সময় লাগবে পায়ে হেঁটে যেতে হলে। অনেক বৃষ্টিতে ভিজতে হবে সেখানে যেতে।

জ্যোতিরিন্দ্র ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

কিন্তু একটা পালকি এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

লক্ষ্মী ঠাকুরের মতো দেখতে অপূর্বসুন্দরী এক যুবতী নারী পালকির পর্দাটা একটু সরিয়ে বলল, 'বৃষ্টিতে এত ভিজছ কেন গো রাজপুত্র? জ্বর হবে যে। সামনে আমার ঘর। আমার ঘরে এখন বসে একটু জিরিয়ে নাও আগে। বৃষ্টি কমলে যেখানে যাবার জন্যে বেরিয়েছ সেখানে যেও।'

জ্যোতিরিন্দ্র থামলেন। 'তুই গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলি বুঝি? এতবেলায় গঙ্গায়? তুই খুব ভোরে যেতিস তো।'

পালকিটা বেহারারা নামিয়ে রাখল। ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে মেয়েটি পালকি থেকে নামল তারপর জ্যোতিরিন্দ্রর বাহু ধরে প্রায় তাকে টেনে নিয়ে গেল নিজের আস্তানার মধ্যে।

জ্যোতিরিন্দ্র আক্ষেপ করলেন, 'কী যে করিস বিনু। এখন কি আমার তোর সঙ্গে বসে বসে প্রেম করবার সময় আছে হাতে? সামনের মাসে 'সরোজিনী' স্টেজে আসবে। মহড়া চলছে। তুই সময় দিতে পারবি না বলেই গোলাপসুন্দরীকে হিরোইন করতে হয়েছে। কিন্তু মহড়া তো বাদ দিলে চলবে না।'

বিনোদিনী হেসে গড়িয়ে পড়লেন। থাক থাক রাজপুত্তুর আর আমাকে ভোলাতে হবে না। আমার সময় হবে কিনা সে তো তুমি ভালো করে জানতেই চাওনি প্রিয়তম। এখন তুমি গোলাপের গন্ধে পাগল হয়েছ। বেশ বুঝেছি। তবে মাথা খাও, এই বৃষ্টির মধ্যে আমি তোমাকে কিছুতে বেরোতে দেবো না। ভাগ্যিস আজ গঙ্গাস্নানে যেতে বেলা হয়েছিল না হলে তুমি তো ভিজতে ভিজতে এখনও অভিসারে রইতে তারপর জ্বর হয়ে পড়ে রইলে কে দেখত বলো দেখি? তোমার বউটা তো শুনেছি আধপাগল খেয়ালি।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাসলেন, 'দুনিয়ার যত আধপাগল মহিলা আমারই ভাগ্যে জোটে রে বিনু। তা আজ গঙ্গাস্নান যেতে দেরি কেন এত? কাল রাতে কে ছিল ঘরে?'

বিনোদিনী হাসলেন, 'আসছে হপ্তায় ন্যাশনাল থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ নামাচ্ছে তো গিরিশবাবু। কাল প্রায় সারারাত মহড়া চলল। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর ঘুম ভাঙতে বড্ড বেলা হয়ে গেল আজ। তারপর জ্যোতিরিন্দ্রর দিকে একটা গামছা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, নাও মাথাটা মুছে নাও তাড়াতাড়ি। নিজে মুছতে পারবে নাকি মুছিয়ে দেব।'

জ্যোতিরিন্দ্র গামছাটা নিয়ে বললেন, 'একটা কিছু চেঞ্জ দে তো বিনু। জামাকাপড়ও

তো একেবারে ভিজে সপসপ করছে।'

বিনোদিনী মাথায় করাঘাত করে বললেন, 'শোনো কথা। পুরুষ মানুষের পোশাক আমি কোথা থেকে এখন পাই বলো তো?

কিন্তু সত্যি তোমার জামাকাপড় বড্ড ভিজে গেছে। তা রাজপুত্র আমার সামনে তোমার আর এত চেঞ্জের কী দরকার বাপু?'

জ্যোতিরিন্দ্র ধমক দিলেন, 'খুব মার খাবি কিন্তু বিনু।'

বিনোদিনী কয়েকটা পোশাক বের করল খুঁজে তার মেহগনি কাঠের দেরাজ থেকে। তারপর বলল, 'নাও। গিরিশবাবুর একসেট জামা মাঝেমাঝে এখানে থাকে। তবে এগুলো কেচে তুলে রাখা। বাসি কাপড় না।'

জ্যোতিরিন্দ্র বললেন, 'শুনলাম নাকি তোর বিয়ে সামনে? গুর্মুখ রায় বলে একটা বখাটে ছেলেকে নাকি বিয়ে করবি বলে কথা দিয়েছিস।'

বিনোদিনীর মুখে হাসি লেগেই ছিল, 'কী আর করব তুমি তো আর আমাকে বিয়ে করলে না। অগত্যা...'

জ্যোতিরিন্দ্র গম্ভীর, 'ঠাট্টা রাখ বিনু। হঠাৎ বিয়ে করছিস তাও একটা আকাট মূর্খ বখাটে ছেলেকে? কী ব্যাপার বল তো?'

বিনোদিনী দেরাজ বন্ধ করে সোজা তাকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দিকে। 'তুমি না রাজপুত্র একেবারে ভালো মানুষ। আমদের লোকে থিয়েটারের টাকা দেয়, আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে কিন্তু আমাদের কি কেউ বিয়ে করে ঘরে তোলে নাকি? নিজের ঘরে আমাদের কেউ চায় না। আর জেনে রেখো আমরাও কারুর ঘরনি হতে চাই না। আমরা আর যাই হই কারুর খাঁচায় পোষা পাখি নই রাজপুত্র।'

বিনোদিনী জ্যোতিরিন্দ্রর পাশে এসে বসলেন, 'তবে হ্যাঁ গুর্মুখের সঙ্গে আমি মেলামেশা করছি। সে যা টাকা দিচ্ছে তাতে আমাদের দলটা বাঁচছে। সে আমার নামে একটা থিয়েটার তৈরি করে দিতে চায়। পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। ওসব টাকা গয়না আমার চাই না। আমাদের দলের জন্যে থিয়েটার করে দিতে হবে। তবে আমি ওর সঙ্গে থাকব।'

জ্যোতিরিন্দ্র আস্তে আস্তে বললেন, 'তোর নামে থিয়েটার করে দেবে আর বদলে তুই তার হবি?'

বিনোদিনী রেগে গেল, 'আমাদের মতো মেয়েরা কারুর একার হয় না রাজপুত্র। তবে গুর্মুখ আমাকে রক্ষিতা করে রাখতে চায় বদলে আমাদের একটা থিয়েটার গড়ে দেবে সে-কী কম কথা?'

সেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাড়ি ফিরতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে গেল। স্ত্রী কাদম্বরী জেগে বসেছিলেন। তাঁকে ফিরতে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। প্রচুর ব্র্যান্ডি পান করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে দেখলেন তাঁর স্ত্রী জানালার ধারে হাতে মাথা রেখে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে। মনে মনে বেশ ভয় পেলেন জ্যোতিরিন্দ্র। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে তাঁদের কোনও সন্তান নেই। একা একা জোড়াসাঁকোয় থাকতে থাকতে প্রায়ই গভীর অবসাদে ডুবে যান তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী। জ্যোতিরিন্দ্র ভাবলেন রবি যদি এখন এসে একটা গান গাইত হয়তো কাদম্বরী আবার হেসে উঠতেন। জ্যোতিরিন্দ্র কাদম্বরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রবি কোথায়? রবিকে নিয়ে তিনজনে চলো কদিন একটু চন্দননগরে একটা ফাঁকা দারুণ বাগান বাড়িতে কদিন কাটিয়ে আসি।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সত্যিই কিছুদিনের চলে গেলেন চন্দনগরে এক মনোরম বাগানবাড়িতে।

বিনোদিনী গুর্মুখের সঙ্গে থাকতে লাগলেন। গুর্মুখের টাকায় গিরিশ ঘোষ থিয়েটার গড়লেন। গুর্মুখ চেয়েছিলেন সে থিয়েটারের নাম হবে বিনোদিনীর নামে। না, বিনোদিনীর নামে থিয়েটারের নাম হয়নি। বিনোদিনীর অভিনয় ভদ্রলোকেরা দেখতে আসে গাঁটের কড়ি খরচ করে, কিন্তু তাঁর নামে থিয়েটার হলে সেটা ঠিক হবে না। কোনও বারাঙ্গনার নামাঙ্কিত থিয়েটারে শহরের মানুষ ঢুকতে লজ্জা পাবে, ভয় পাবে।

তাই বিনোদিনীকে গুর্মুখ যে টাকা দিলেন সেই টাকায় যে থিয়েটার হল গিরিশচন্দ্র ঘোষ তার নাম দিলেন 'স্টার থিয়েটার'।

শহরে সকলে বলল 'ভালোই হয়েছে। কোনও বেশ্যার নামে আবার থিয়েটার হয় নাকি!'

জ্যোতিরিন্দ্র স্টার থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে নিলেন। তিনি তো জানেন এই থিয়েটার তার বিনুর জীবনের ওপর দিয়ে তৈরি হয়েছে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ জুলাই ২০১৭

সাইকেলের স্থান ইতিহাসের পাতায় নাকি সবুজসাথীর সাফল্যে

স্বর্ণালী পাল

ট্রাফিক পুলিশকে ১০০ টাকা দিতে হবে শুনে বেশ অবাক হয়েছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন নিজেরই তো সাইকেল, কাউকে ধাক্কাও দিইনি, ট্রাফিক নিয়ম মেনেই আস্তে আস্তেই চালাচ্ছি, তাহলে? কারণ শুনে তো আরও অবাক। নাম চিরঞ্জীব, বাড়ি বেহালা চৌরাস্তা, ইলেকট্রিকের কাজ করেন, হোটেল প্রিন্স-এ কাজ করতে আসছিলেন। গোলপার্কের মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ জানান এই রাস্তায় সাইকেল চালানো নিষিদ্ধ। খুব চিন্তায় পড়লেন, এখন না হয় টাকা দিয়ে দিলেন। কিন্তু তাকে অনেক জায়গায় কাজের জন্য দৌঁড়তে হয়। তখন কী করে যাবেন? বাস, অটোতে উঠলে তো আবার ভাড়া গুনতে হবে। সমস্যায় পড়েছেন অনিতা সরকারও। কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তায় যে সাইকেল চালানো বন্ধ সে খবর তিনি আগেই পেয়েছেন। কিন্তু সাইকেলটাকে নিয়েই তো তাঁর দিন চলে। বছর পঁয়ত্রিশের এই অক্ষরজ্ঞানহীন মহিলার বাড়িতে রয়েছেন একমাত্র বোবা ছেলে। তিনি লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেন। পেটের জন্য সময় বাঁচাতে সাইকেলে ঘুরে ঘুরেই তাঁকে কাজ করতে যেতে হয়। এখন তাঁর একটাই চিন্তা কী করে নিজেদের রোজগার চালাবেন? এমনই কিছু অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলাম 'কলকাতা'র আজকের আলোচনায়...

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় কলকাতার রাস্তায় সাইকেল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত? সারা বিশ্বের আধুনিক শহরগুলি যখন এই দূষণহীন যানকে আপন করে নিচ্ছে। শুধু দূষণহীন নয়, সাশ্রয়ীও বটে। এছাড়াও সাইকেল চালানোর অন্যতম এক সুবিধা হল দৈনন্দিন ব্যস্তজীবনে একটু এক্সারসাইজও হয়। এইসব কারণের জন্য সারা বিশ্ব একে আপন করে নিলেও আমাদের কলকাতা কিন্তু একে কার্যত পিছনে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। প্রশাসনের যুক্তি হল, কলকাতায় গাড়ির তুলনায় রাস্তা অত্যন্ত কম। তার উপর যদি এই ধীরগতির যানকে যানবাহনের রাস্তায় চালানোর অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে একদিকে যেমন যানজট বাড়বে তেমনই দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বাড়বে। তাহলে প্রশ্ন হল, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কলকাতায় যে ২.৫ মিলিয়ন মানুষ সাইকেলের উপর নির্ভর করে তাঁদের দিন গুজরান করেন তাঁদের কী হবে? সরকারি এই সিদ্ধান্ত কি তাহলে মানবিকতার পরিপন্থী? এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব হয়েছেন সাইকেলপ্রেমী বেশ কিছু মানুষ। তাঁদের বক্তব্য কলকাতায় সাইকেলের জন্য আলাদা রাস্তা করা হোক। সেই দাবি পুরোটা মানা সম্ভব না হলেও ইএম বাইপাসসহ বেশ কিছু রাস্তায় আলাদাভাবে সাইকেলের জন্য লেন রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সেই প্রোজেক্ট এখনও বিশ বাঁও জলেই পড়ে আছে বলে সাইকেল আন্দোলনের সাথে যুক্ত আন্দোলনকারীদের অভিযোগ।

কলকাতার মতো দূষিত শহরে প্রথমে ৬২টি রাস্তায় দূষণহীন যান সাইকেল চালানো নিষিদ্ধ করেছিলেন পুলিশ কমিশনার সুরজিৎ পুরকায়স্থ। তার মধ্যে ৩৮টি প্রধান সড়ক। ২০১৩ সালে সংখ্যাটা বেড়ে হয় ১৭৮। যা বিতর্কের সৃষ্টি করে। ট্রাফিকের ভিড়ে ব্যস্ততম রাস্তায় দ্রুত গতির যানের কাছে সাইকেল নিরাপদ নয় এই কারণ দেখিয়ে তাই পার্ক স্ট্রিট, শেক্সপিয়র সরণি, রেড রোড, ক্যামাক স্ট্রিট, বালিগঞ্জ, কসবা, গলফগ্রিন, বিবাদি বাগের মতো ব্যস্ততম সড়কে বন্ধ করা হয়েছে এই দূষণমুক্ত যানটিকে। এর আগে দিল্লি, পুনের মতো একশোরও বেশি জনবহুল শহরে ধীর গতির যানের কারণে সাইকেলকে বন্ধ করা হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু পথ থেকে। পরিবর্তে তার জন্য নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কলকাতা শহরে তেমন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেই পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ইএম বাইপাসে সাইকেল লেনের কাজ চালু হলেও তা এখনও শেষ হবার কোনও আশা দেখছেন না নিত্যদিনের ভুক্তভূগীরা। কলকাতার মতো সরু রাস্তায় আলাদা করে সব যায়গায় সাইকেলের জন্য পথ বানানো সম্ভব না-ও হতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতায় প্রতিদিন কাজের তাগিদে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন মানুষকে সাইকেলে যাতায়াত করতে হয়। যেমন— খবরের কাগজ বিক্রেতা, দুধ বিক্রেতা, ডাব বিক্রেতা, বাসন বিক্রেতা, সোফাসারানোর মিস্ত্রি, সবজিবিক্রেতা, লাড্ডু বা গজা বিক্রেতা, কলের মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, চা বা মিষ্টির দোকানের কর্মচারি প্রভৃতি। এঁদের গাড়ি ভাড়া দিয়ে যাওয়া-আসার মতো সামর্থ নেই। এতগুলো নাগরিকের কথা না ভেবেই কি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল? যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'সবুজ সাথী'র মতো প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল দিয়ে পড়াশোনা করে স্বনির্ভর হবার উৎসাহ দিচ্ছে সেখানে কলকাতার রাস্তায় পরিবেশবান্ধব সাইকেলকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে? তাহলে সাইকেলগুলোকে কাজে লাগাতে পারবে না পড়ুয়ারা? মুখ্যমন্ত্রী নিজে শিলিগুড়িতে গিয়ে ঘোষণা করেন যে ফি বছরে সাইকেল মেরামতির জন্য ৩ হাজার যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা। এমনকী সেই সঙ্গে সাইকেল শিল্পের জন্য বিনিয়োগের আহ্বানও জানান তিনি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বৃষ্টিতে কলকাতার জলছবি চিরকালের অতিপরিচিত। জলপূর্ণ মহানগরীতে সাইকেলের আনাগোনা আরও চেনা একটি চিত্র। জলজমা রাস্তাতে মোটর গাড়ি যখন চালানো সম্ভব হয় না বা রাস্তার মাঝখানে আটকে থাকে তখন সাইকেলই হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসা। সাইকেল আছে বলেই কাগজ বিক্রেতা সকালেই পৌঁছে যায় কাগজ নিয়ে বাড়ি বাড়ি। ঠিক তেমনই সাইকেল আছে বলেই বর্ষাকালে নিরাপদে বাড়িতে দুধ পৌঁছে যায়। প্রশ্ন হল, সরকারি কাজের জন্যও কি কোনও ছাড় মিলবে না? যদি তাই হয় তাহলে আমরা চিঠির মতো গুরুত্বপূর্ণ পত্রই-বা পাব কী করে? পোস্টম্যান তার কাজ করবে কী করে? পিয়নদের জন্য তো এখনও পর্যন্ত বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। চিঠি আদান-প্রদানের পরিষেবাটাও তো প্রশ্নের মুখে। শুধু কি তাই, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বয়সের ভারে রোজ বাজারে যেতে পারেন না তাই মাছ থেকে সবজি সবই বাড়ির দরজার সামনে আসা ফেরিওয়ালাদের থেকেই কেনেন। এদিকে তার বাড়ির সামনে সাইকেল চালানোর নিয়ম নেই। তিনি খুবই চিন্তিত এবার কী করে বাজার করবেন!

শুধু রোজগারের জন্য বা গরিব, এই কারণেই যে সাইকেল সেটা একদমই নয়। এমন এক অংশ আছে যাদের কাছে সাইকেল চালানোটাই আনন্দের। বয়সের কোন গণ্ডি নেই, আনন্দে মেতে ওঠার নামই সাইকেল। সাইকেল চালানো শরীরের জন্য ক্ষতিকর বা অসুবিধার কারণ তৈরি করে না (বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম) নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি সেখানে যাওয়া যায়। ডিজেল, পেট্রল অর্থাৎ কোনও জ্বালানি লাগে না সুতরাং ব্যয়বহুলও নয়, জ্বালানিবিহীন হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কারও ক্ষতিও করে না, বিপদের সম্ভবনাও কম। তাই এই যান অনেকেরই পছন্দের। সাইকেল নামটার সাথেই আমাদের সবার ছোটবেলা জড়িয়ে থাকে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই সাইকেল নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বেরোনো আর বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে গেলেই ভয়ে ভয়ে ঘরে ফেরা। প্রথমে বাড়ির কারও একটা সাইকেল নিয়ে হাফ প্যাডেল শেখা, কয়েকবার পড়ে গিয়ে হাত-পা কেটে সাইকেল শেখা এইসব রঙিন দিনগুলোর কথাই মনে পড়া। আর সেই সাইকেলই এখন আর নিজের ইচ্ছেমতো যে কোনও রাস্তায় চালানো যাবে না। এছাড়াও রাজনৈতিক মিটিং মিছিল-আন্দোলনের কারণে যান চলাচল অনিয়মিত থাকলে জরুরি দরকারে সাইকেলই একমাত্র সাহারা। তবে হ্যাঁ হেঁটে যাওয়া যেতেই পারে কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ। আবার কোনও জরুরি দরকারে রিকশা বা অন্য কোনও গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এত সুবিধার মধ্যে বাধ সাধল এই নিষেধাজ্ঞা। তারপর শপিং করতে যাওয়া বা বন্ধুরা মিলে কাছাকাছি ঘুরতে যাওয়ার জন্য সাইকেলের জুরি মেলা ভার। সুতরাং দৈনন্দিন জীবিকার জন্যই হোক, পরিবেশ রক্ষার কারণেই হোক বা বেখেয়ালে সঙ্গীকে নিয়ে ঘুড়তে যাওয়াই হোক— সাইকেলের গুরুত্ব অপরিসীম।

২০০৬ সালে জাতীয় শহুরে যান চলাচল নীতি অনুযায়ী সাইকেলের মতো পরিবেশবান্ধব যানগুলিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু তা হয়নি বরং ২০১৩-তেই কলকাতার ১৭৪টি রাস্তায় সাইকেল চালানো বন্ধ করা হয়েছে। যে-নিয়ম বা আইনের বেড়াজালে জড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবন, সেই আইন বা নিয়মের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে রাজ্য হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামালা দায়ের করা হয়। কারণ এই সিদ্ধান্তে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো কঠিন সমস্যায় পড়েছেন। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষেরা সংখ্যায় অগণিত। তাদের কাছে সাইকেলই একমাত্র ভরসা। সেই ছবি কি তাহলে এবার ইতিহাসের পাতায় বন্দি হল? তাই সমাজের সব স্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সাইকেল চালানো যাতে বন্ধ না হয়ে যায় বা সাইকেলের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা তৈরি করার লক্ষ্যে দাবি তুলেছে।

কলকাতার রাস্তায় সাইকেল চলবে কিনা তা নিয়ে প্রশাসন যেমন একের পর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে চলেছে, তেমনই বিরোধী মতও ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু এসবের মধ্যে বেঁচে থাকবে তো এই নিরীহ যানটি?

পত্র-পত্রিকা

কৃষ্ণগোপাল রায়

সংবাদ বা সাময়িকপত্র প্রকাশে ইংরেজরাই বাঙালি তথা ভারতবাসীর আদর্শ। স্বাভাবিকভাবেই তার সূচনা ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী কলকাতায়। ইংরেজরা এই উপনিবেশে যে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করে, তার নাম 'ইন্ডিয়া গেজেট' (১৭৭৪)। এতে সরকারের আদেশ, ইস্তাহার, সিদ্ধান্ত এই সবই ছাপা হতো, সঙ্গে থাকত কিছু বিলেত ও এদেশের খবর। এর দু'বছর পর বেরোয় 'বেঙ্গল গেজেট'। সম্পাদকের নামানুযায়ী লোকে বলত 'হিকি গেজেট'। সম্পাদক জে এ হিকি কিন্তু আগের পত্রিকাটির মতো সরকারের তাঁবেদার ছিলেন না; ওয়ারেন হেস্টিংস, এলিজা ইম্পে, ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রমুখ সমসাময়িক ক্ষমতাসম্পন্নদের দোষত্রুটির কথা খোলাখুলি বলতে কোনও দ্বিধা করতেন না। ১৭৮৫-তে 'ক্যালকাটা ম্যাগাজিন' বা 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' (একই পত্রিকার যুগপৎ দুই নাম) নামে যে-পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেটাও সরকারের স্তাবকতাই করত। প্রথম কাগজ 'ইন্ডিয়া গেজেট' মাঝে বন্ধ হয়ে ১৭৯২ সালে আবার বেরোতে শুরু করে। চরিত্র একই থাকে, বেড়ে যায় বিলেতের এবং অন্যান্য

দেশের খবর। তবে বিলেত বা ইউরোপীয় দেশের যেসব খবর এখানে থাকত তা ছয় মাসের বেশি পুরনো, কারণ সে সময় টেলিব্যবস্থা ছিল না। বিলেত থেকে জাহাজ এলে তবে খবর পাওয়া যেত। এইসব খবর সংগ্রহের জন্য সাংবাদিক, সম্পাদকরা উজিয়ে গিয়ে জাহাজে চেপে খবর সংগ্রহ করত।

১৭৯৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' নামে আরেকটা পত্রিকা, পরের বছর বেরোয় 'বেঙ্গল হরকরা'। হরকরা ছিল সাপ্তাহিক। সে বছরেই শেষের দিক থেকে আরেকটা সাপ্তাহিক বেরোতে শুরু করে 'ইন্ডিয়ান অ্যাপোলো'। ১৭৯৯-এ 'রিলেটার' নামে আরেকটা পত্রিকা বেরোতে থাকে সপ্তাহে দু'বার করে। ১৮১৮-তে বেরোয় দুটি পত্রিকা— 'ক্যালকাটা জার্নাল' এবং 'ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ প্রাইস কারেন্ট', লোকে বলত 'এক্সচেঞ্জ গেজেট'। এই বছরের জুলাই মাস থেকে বেরোয় আরও দুটি পত্রিকা— 'এশিয়াটিক ম্যাগাজিন' ও 'মেডিক্যাল মিশলেনি'। ১৮১৭ থেকে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা বের করে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'।

একের পর এক এইসব পত্রিকা বেরোনোয় প্রমাণ হয় পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। পত্রিকাগুলির দামও কম ছিল না, ৪ থেকে ৬ টাকা, যা অনেক নেটিভের প্রায় সারা মাসের আয়। কোনও কোনওটির অবশ্য দাম ছিল এক টাকা। সংবাদপত্রকে কিন্তু প্রথমেই ভয় পেয়েছিল সরকার, তাই ১৭৯৯ সালে প্রণীত হয়েছিল 'সেন্সরশিপ অ্যাক্ট'। লর্ড উইলসন বন্ধ করে দিয়েছিলেন রবিবারের খবরের কাগজ। আদেশ জারি করেছিলেন রেফারেন্স না দিয়ে কোনও খবর ছাপা যাবে না। সম্পাদককে কাগজের ডিটেলস জমা দিতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। মিলিটারি খবর-রাজনৈতিক খবর ছাপা যাবে না, নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হবে কর্তৃপক্ষকে... ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে বাধা সেখানেই অবরুদ্ধের স্ফূর্তি। সবাই জেনে গেল সরকার সংবাদপত্রকে ভয় পায়। ১৮১৬-তে অবশ্য লর্ড মিল্টন সংবাদপত্রকে আবার স্বাধিকার ফিরিয়ে দেন। ১৮১৬-র আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এগুলো সবই ইংরেজি, সবগুলোই খবরের কাগজ, মুদ্রণগুণ অনুচ্চ মানের, কাগজগুলো ভালো না, সাইজ নানারকম, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২ থেকে ৮, দাম ১ থেকে ৬ টাকা, উদ্দেশ্য মূলত অর্থোপার্জন, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সরকারকে খুশি করা অথবা সরকারের বা কর্তাব্যক্তিদের নিন্দে বা সমালোচনা করে নিজেদের নিহিত স্বার্থ পূরণ করা। এছাড়া এই পরবাসে ইউরোপের সংবাদ পরিবেশন দেশীয় মৌতাত বজায় রাখাও ছিল এইসব পত্রিকার আরেক লক্ষ্য। হিকি কিন্তু একটা আদর্শ মেনে চলেছেন বরাবর, তাঁর আগের আদর্শ ঘোষণা করে তিনি লিখেছেন, ' a weekly political and commercial paper to all parties, but influenced by none'— মিশনারিদের 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'-র উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির খবর ছেপে তাদের হীন ও অসভ্য প্রতিপন্ন করা।

১৮১৬-তে বাংলায় প্রথম প্রকাশ করেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য 'বেঙ্গল গেজেট'। এর একটি কপিও পাওয়া যায়নি বলে এ পত্রিকার লক্ষ্য বা প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বাংলার পত্রিকা হল শ্রীরামপুরের মিশনারি জন মার্সম্যানের সম্পাদনায় 'দিকদর্শন'। এতে ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধও থাকত। মুসলমান রাজত্ব বিস্তার, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার, পর্তুগিজদের ভারতে আগমন, ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি, ভারতের বনজ সম্পদ, কম্পাসের ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয়ে গবেষণাধর্মী লেখা মূল্যবান করে তুলেছিল 'দিকদর্শন'কে। কিন্তু পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি। ১৮১৯-এ মার্সম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাটি সরকারি দাক্ষিণ্য লাভ করে; এর পোস্টেজ মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়, সরকারি অফিসে সংগ্রহ করা হয়। তবু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল এ-পত্রিকা। চাকরির বিজ্ঞাপন, ইউরোপের খবর, ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর সরকারি আইন-কানুনের খবরের পাশাপাশি রাজনীতি, জনজীবন, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়েও সংবাদ বা ফিচার ছাপা হতো এখানে। বহুবিবাহ বা কৌলিন্য প্রথার বিপক্ষে, ইংরেজি শিক্ষা চালু করার পক্ষে, স্কুল-কলেজ স্থাপনার পক্ষে, নারীশিক্ষা প্রচলনের পক্ষেও বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এরা হিন্দুধর্মের উপর ক্রূর আক্রমণ করত। ১৮২১-এর জুলাইয়ে প্রকাশিত এমনই এক প্রবন্ধের প্রতিবাদ সম্পাদক না ছাপায় রামমোহন রায় সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রকাশ করেন 'সংবাদ কৌমুদি'। এই ১৮২১ সালেই তিনি বের করেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই হল নবজাগরণের সূচনা। এদেশের হিন্দু-মুসলমানকে ভুল বুঝিয়ে বিনামূল্যে বাইবেল পুস্তিকা প্রদান করে খ্রিস্টধর্মে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত করার যে চতুর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল মিশনারিরা, রামমোহন তার সজোর প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। অলস নিদ্রা ছেড়ে সেই দেশবাসীর জেগে ওঠার শুরু।

ভবানীচরণ কিন্তু রামমোহনের মতো প্রগতিশীল ছিলেন না। তাই সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করলে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয় এবং রামমোহনকে ছেড়ে দিয়ে ১৮২২-এর মার্চ থেকে তিনি বের করেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'। এখানে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে তিনি জোর প্রচার চালান। সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার উদ্যোগের বিরোধিতা করেন তিনি, ইয়ং বেঙ্গলদের আক্রমণ করেন তীব্র ভাষায়, হিন্দুদের ত্রিকালগত সংস্কার, আচার-বিচার, পূজা-পার্বণের নিয়ম ফলাও সংবাদ ছাপেন মহোৎসাহে। স্বভাবতই 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং 'সংবাদ কৌমুদী'কে ঘিরে তখনকার কলকাতা রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল— এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর অন্য ফল যাই হোক, বাঙালির মন ও মেধা সক্রিয় হয়ে ওঠে স্বদেশের হিতচিন্তায়।

এরই ফলে এসময় 'সংবাদ তিমির নাশক' (সম্পাদক কৃষ্ণমোহন দাস), 'বঙ্গদূত' (নীলরতন হালদার), 'জ্ঞানান্বেষণ' (দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক), 'সংবাদ রত্নাকর' (ব্রজমোহন সিংহ), 'জ্ঞানোদয়' (রামচন্দ্র মিত্র), 'বিজ্ঞান সেবাধীশ' (গঙ্গাচরণ সেন) ইত্যাদি অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এদের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সংবাদ পত্রিকা হিসাবে বৈচিত্র সৃষ্টির চেষ্টা প্রত্যেকে করেছে। কিন্তু সবার মধ্যে মিল একটা আছেই— সেটা হল দেশপ্রেম। দেশকে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত করে, নানান ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের সারবত্তাহীনতা ব্যাখ্যা করে, ঐতিহ্যের মহত্ত্ব প্রকাশ করে, আত্মমর্যাদাবোধের আদর্শ তুলে ধরে নানা মুখে চলছে এই দেশহিত কর্ম।

ঠিক এমনই সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশ করলেন তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' (২৮ জানুয়ারি, ১৮৩১)। খুব যে মেধার উচ্চতা ছিল তা নয়, খুব যে প্রগতিশীল ছিলেন তা নয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যেটা পারলেন তা হল অনেক মানুষকে সমন্বিত করে ফেলতে। ইয়ং বেঙ্গলদের তিনি বিরোধিতা করেছেন, নারীশিক্ষার বিরোধিতা করেছেন, বিধবা-বিবাহ প্রসন্নচিত্তে মানতে পারেননি। তাঁর প্রস্তাব ছিল বিধবাদের মধ্যে যারা অক্ষতযোনি কেবল তাদেরই বিয়ে দেওয়া হোক। ইংরেজদের প্রতি তাঁর প্রবল বিরাগ কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহে ইংরেজের জয় চেয়েছেন খোলাখুলি, ভিক্টোরিয়া শাসনভার গ্রহণ করলে আনন্দে বিগলিত হয়েছেন, আবার তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদী। এই স্ববিরোধিতাগুলোর জন্য আজ যাই হোক, এগুলোই তাঁকে সে-যুগে এত জনপ্রিয় করেছিল, কারণ মধ্য-মেধা স্ববিরোধীতেই ভরা। তবে ঈশ্বর গুপ্তও দেশপ্রেমিক। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তিনিই বোধহয় প্রথম কলম ধরেছেন। ইংরেজ সরকার যে এদেশকে শোষণ করছে, এদেশের উন্নয়নের জন্য যে তেমন কিছুই করছে না, নীলচাষের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা যে এদেশের কৃষককূলকে চরমভাবে নির্যাতন করছে, মিশনারিরা যে চতুর প্রক্রিয়ায় এদেশের ধর্মশীল করছে— এসব বলেছেন তিনি অকুতোভয় হয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেছেন, মনে করেছেন দেশের নবযুবকদের কর্মপ্রাপ্তির পথ খুলবে এই শিক্ষাঙ্গনে পড়াশুনো করে। তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'-ই মাসিক থেকে সাপ্তাহিক, তারপর দৈনিক প্রকাশিত হয়। বাংলার প্রথম দৈনিক এটাই।

'সংবাদ প্রভাকর' যেমন সংবাদের উপর বেশি জোর দেয়, তেমনি ঠাকুরবাড়ির নিয়ন্ত্রণে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধনী' জোর দেয় দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, অর্থনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বৌদ্ধিক আলোচনায়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবি এই পত্রিকাতেই প্রথম উত্থাপিত হয়। মিশনারিদের প্রতিরোধ করে দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারেও সোচ্চার হন অক্ষয়কুমার। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারও ছিল স্বদেশকে মনন সম্পদে ধনবান, আত্মনিষ্ঠায় মর্যাদাসম্পন্ন এবং দেশপ্রেমে বলিষ্ঠ করা।

এরপর পরের পাতায়

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১৭ জুলাই ২০১৭

পত্র-পত্রিকা

(আগের পাতার পর)

১৮৫১-র অক্টোবর মাস থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রকাশ করেছিলেন ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ পত্রিকা। নানা বিষয়ে মনোজ্ঞ রচনার দিকে জোর দেয় এই মাসিক। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনী, অজন্তা-ইলোরার গুহা, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, মিশরের পিরামিড ইত্যাদি নানা ঐতিহাসিক স্থাপত্যের বৃত্তান্ত; রাশিয়া, ভেনিস, বুন্দেল, কাশ্মীর, জয়পুর ইত্যাদি নানা দেশ-বিদেশের ইতিহাসের পাশাপাশি সাবান, কাশ্মীরি শাল, সেতু ইত্যাদি তৈরির কৌশলও ছাপা হয়েছে ‘বিবিধ সংগ্রহ’তে। দশ বছর চলেছিল এই পত্রিকাটি। এর সব লেখার লক্ষ্যে ছিল দেশহিত।

প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদার প্রকাশ করতেন ‘মাসিক পত্রিকা’ (১৮৫৪)। এর মূল লক্ষ্য ছিল নারী-উন্নয়ন। কলকাতার চলিত ভাষায় এর সংবাদ ও অন্যান্য রচনা ছিল মেয়েদের সহজবোধ্য করার জন্যই। প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরে দুলাল’ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’ (১৮৫৫)-র উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টত সমাজমঙ্গল ও স্বদেশহিত। মদ্যপান, বেশ্যাগমন, ধর্মীয় কুসংস্কার, পুতুলের বিয়ে, পায়রা-ঘুরির আমোদ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিকাশের কাজে আত্মোৎসর্গ করার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা হয় এ-পত্রিকায়।

১৮৫৮-এর নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় বেরোয় ‘সোমকাশ’। সাপ্তাহিক এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিদ্যাসাগর। শিবনাথ শাস্ত্রী, মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ এ-পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন পরবর্তী সময়ে। এ পত্রিকারও উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ কল্যাণ। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতে করানোর জন্য এ-পত্রিকা দাবি তোলে। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে হরিশ মুখার্জীর ‘দ্য হিন্দু’ পত্রিকার মতোই। বিজ্ঞানচর্চা, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, হিন্দু-ব্রাহ্ম সমন্বয় সাধনে সামাজিক সংহতি গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে ‘সোমপ্রকাশ’-এর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন ‘বঙ্গদর্শন’। মহাকাব্য-পুরাণের নব মূল্যায়ন, ইতিহাসচর্চা, সামাজিক সাম্য, বন্ধনমুক্ত নীতিশীলিত জীবন, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি নানামুখী উদ্যোগে এ-পত্রিকার লেখাগুলি বাঙালি জীবনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। আবার এসবেরই পাশাপাশি আসে উপন্যাস, ভ্রমণ সাহিত্য, রম্যরচনা ইত্যাদি। কবিতাও ছাপা হতো। এই ইতিবৃত্তে একটা জিনিস লক্ষ করার, এতদিন সংবাদপত্রগুলি ছিল নিবন্ধনির্ভর। কিছু কিছু পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন সংবাদ থাকত, কিন্তু সাহিত্য ছিল কম। প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের আগে ভবানীচরণের কাছে কিছু ন্যাক্যাধর্মী লেখা পাওয়া যায় বটে, তবে ‘বঙ্গদর্শন’ থেকে সাহিত্যই আকর্ষণের প্রধান দিক হয়ে ওঠে। ‘বঙ্গদর্শন’-এর পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ‘সাহিত্য’, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ‘হিতবাদী’, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সাধনা’, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ‘ভারতবর্ষ’, প্রমথ চৌধুরীর ‘সবুজপত্র’ প্রভৃতি ক্রমেই সংবাদকে ছাড়িয়ে যায়। সমকালীন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে মননশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধ থাকলেও সংবাদ লুপ্ত হয়ে গেল এসব পত্রিকা থেকে।

রাজনৈতিক দাবদাহের সময় সমাজ তখন অতি উত্তপ্ত; নানাবিধ সংবাদের প্রয়োজন তখন হু হু করে বাড়ছে। অবস্থার দাবি! ১৮৮৬-তে তুষারকান্তি ঘোষ তাঁর ঠাকুমার নামে বের করেন ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’; আর ১৯২২ সালে তাঁর ঠাকুমার বোন আনন্দময়ীর নামে বের করেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’। আনন্দবাজার আগে যশোরে বেরিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৬ থেকে বঙ্গভঙ্গের তুমুল স্বদেশি উদ্দীপনা বুকে নিয়ে প্রকাশিত হতো বারীন্দ্র ঘোষের ‘যুগান্তর’। বেরনোর পরে পরেই পত্রিকাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়; কুড়ি হাজার কপি ছাপা হতো। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৭-এ অ্যারেস্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত এ পত্রিকা অনায়েই সম্পাদনা করেছেন। ১৯০৮-এ কাগজটি বন্ধ করে দেওয়া হয় উত্তেজক সংবাদ ছাপার অভিযোগে। ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকা বের করতেন অরবিন্দ ঘোষ; লক্ষ্য একই কিন্তু যুগান্তরের মতো খোলাখুলি জ্বালাময়ী লেখা এতে থাকত না। মুরারিপুর অ্যারেস্টের পর এ-পত্রিকাও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৪ থেকে বেরোয় ‘বসুমতি’, প্রথমে সাপ্তাহিক পরে দৈনিক। কাজী নজরুল ইসলাম বের করেছিলেন ‘ধূমকেতু’, ‘লাঙল’, ‘যুগবাণী’। এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ঠিকই, কিন্তু খুবই প্রভাববিস্তারী ছিল।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত আরও অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতায়। এদের মধ্যে কোনও কোনও পত্রিকা ছিল বিশুদ্ধ সাহিত্যের, কোনও কোনও পত্রিকা সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞান-বাণিজ্য-রাজনীতি-সংবাদ রাখতে চেয়েছে, আবার কোনও কোনও পত্রিকা প্রাধান্য দিয়েছে বিশুদ্ধ সংবাদকে। সব ধরনের পত্রিকাতেই থেকেছে প্রবন্ধ-নিবন্ধ। সংবাদপ্রধান পত্রিকা প্রকাশ কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমদিকেও ভাবা যেত না, কারণ ছিল সংবাদ সংগ্রহের সমস্যা। ১৮৪৯-এ পল জুলিয়াস রয়টার টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার সাহায্যে নিজের নামে ‘রয়টার’ সংবাদ সংস্থা গড়ে তোলেন, যা মুনাফা কামাত বিভিন্ন সংবাদপত্রকে খবর বেচে। উত্তরোত্তর আরও নানা সংবাদ সংস্থা তৈরি হয়েছিল। যারা খবরের কাগজের পাতা ভরানোর রসদ যোগান দিত। সংবাদ সংস্থাগুলো প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সংবাদপত্রকে আর নিবন্ধ লিখে পাতা ভরাতে হতো না। পাঠকও ঘরে বসে প্রায় সারা বিশ্বের খবর পেত। সুতরাং এ-সময় থেকে পত্র-পত্রিকার চরিত্র বদল ঘটতে থাকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দু’বছর পর থেকে কাজ শুরু করে পিটিআই। এতে সংবাদপত্রগুলির আরও সুবিধে হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সংবাদপত্রগুলির চরিত্র বদল হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্বের প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকার মধ্যে দেশ গড়ার সংকল্প ছিল। পথ ও মত যতই অন্যের সঙ্গে পৃথক হোক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশপ্রেম অনেকটা গৌণ হয়ে গেল— তারা হয়ে উঠল আসলে মার্চেন্ট হাউস। সরকারের ভুলত্রুটি দেখানো, কাজ বা কর্মপদ্ধতির সমালোচনা, নতুন করণীয়ের উপর আলোকপাত ইত্যাদি তারা নিজ নিজ ভাবে করল ঠিকই, কিন্তু দেশপ্রেমের আবেগ প্রায়শ তরলই হয়ে গেল, প্রাধান্য পেল কী লিখলে পাবলিক(পাঠক)কে চমক দেওয়া যাবে, কিসে বাণিজ্য হবে, সরকারকে কিসে খুশি করা বা ভয় দেখানো যাবে— ভয় দেখিয়ে বিজ্ঞাপনাদি ও অন্যান্য গোপন সুবিধা অর্জন করা যাবে ইত্যাদি হল স্বাধীনতা-উত্তর যুগের অধিকাংশ সংবাদপত্রের অঙ্ক। এরা শালীনতার কথা লেখে আর অশালীন বিজ্ঞাপন ছাপে, সরকারের সমালোচনা করে আর সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচার করে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে লেখে আর তাবিচ-কবচ-বশীকরণের প্রচার করে। কেচ্ছা বেচে, নগ্নতা বেচে, কুসংস্কার বেচে, রাজনীতি বেচে, দলানুগত্য বেচে আর কলম খাটায় এদেরই বিরুদ্ধে। আগে মতাদর্শ যাই হোক, প্রায় প্রত্যেকে পত্রিকার নিজস্ব সততা এবং দায়বোধকে সমীহ করত মানুষ, প্রত্যয়ের সঙ্গে উদ্ধৃতি দিত সংবাদপত্র থেকে। এখন চায়ের দোকানে ‘খবর’ নিয়ে কলহ চললেও পাঠক বেশিরভাগ কাগজের খবর নিয়ে দ্বিধায়, সে যা পড়ছে তা বৈধ সত্য এবং নিরপেক্ষ তো...?

লেখক চাপরা বাঙালঝি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ
ফোটো: হৃদয় মালাকার

খাবার-দাবার @ কলকাতা

স্পাইসি ময়দান

সৈকত ঘোষ

বৃষ্টি মানেই প্রেমের মরশুম আর প্রেম মানেই একবুক ময়দান, ভিক্টোরিয়ার বাদামভাজা। Y2K-এর আগে অবধি কলকাতার সিনটা ছিল মোটামুটি এই রকম। এরপর দ্রুত দিন বদলেছে 4G যুগে বদলে গেছে চাহিদার ডেফিনেশন। আজকে আমরা অনেক বেশি কসমোপলিটন। ঝাঁ-চকচকে শপিংমল, মাল্টিপ্লেক্স, ফ্ল্যাট কালচার বদলে দিয়েছে বেসিক সিনারিও। ফলত বাদাম ভাজাকে রিপ্লেস করতে হাজির ক্রিসপি চিকেন। সবুজ কলকাতার বুকে গজিয়ে উঠছে একের পর এক স্কাইরাইজ। ধীরে ধীরে শহরটা সরে যাচ্ছে দক্ষিণে। তবে যে যাই বলুন না কেন আমার কিন্তু মনে হয় লড়াইটা এখনও সমান সমান। প্রকৃতির কোলে খোলা ময়দান বা ভিক্টোরিয়ার গার্ডেনে বসে প্রেমের যে মজা কে এফসি বা সিসিডি-তে সেটা কোথায়! সব থাকলেও কিছু একটাকে আপনি মিস করবেন... আর সেটা খুঁজতেই চলুন না আর একবার না হয় ট্রামে চড়ে পৌঁছে যাই নস্টালজিয়ায় শহর সিটি অব জয়ের হৃদপিন্ডে।

যাঁরা জানেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন বৃষ্টিদিনের ময়দান এক্কেবারে অন্যরকম। লাল-নীল ছাতা মাথায় এখানে সেজে ওঠে মেঘরং বান্ধবীরা। প্রকৃতিও এক অদ্ভুত হাতছানিতে আপনাকে ডাকবে, যে ডাক উপেক্ষা করা ভারি মুশকিল। সবুজ গালিচায় আলোর লুকোচুরি, হওয়ার গল্প হয়ে সে ছুঁয়ে দেয় ঠোঁট। নিয়নভেজা শহরে এভাবেই হঠাৎ বেজে ওঠে প্রেমের রিংটোন। ঘাসের সুড়সুড়ি আর আলতো আঙুলে বিলি কাটতে কাটতে চাচার স্পেশাল লেবু চা...সময়কে থামিয়ে দেওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট নয় কি? মুহূর্তকে ফিল করে বেশ কিছুক্ষণ মিউট থাকার পর একটু চটপটা তো চলতেই পারে। আর তাই ময়দানের চারিধারে আপনার জন্য হাজির এক সে বরকর এক জিভে জল আনা চাটের সমাহার। পাপড়ি চাট, ভেলপুরি, ঝালমুড়ি, ছোলা-মটর, আলুকাবলি, ঘুগনি— কী নেই! চটপট আপনার পছন্দমতো মেনু থেকে যে কোনও একটা বেছে নিতেই পারেন। এ প্রসঙ্গে একটাই কথা বলব, এই

রোড সাইড ফুড খেয়ে এবং খাইয়ে যে মজা পাবেন সেই মজাটা হয়তো অনেক নামী দামি রেস্টুরেন্টও দিতে পারবে না। আর হ্যাঁ, আউটলুক এবং দাম দিয়ে সবসময় ভালোলাগার পরিমাপ করা যায় না। ভালোলাগার একমাত্র প্যারামিটার ভালোলাগা। সুতরাং বাই ওয়ান গেট ওয়ান জমানায় হারবাল প্রেমের সাথে স্ট্রিট ফুডের মজা নিতে হলে ময়দান অবশ্যই হট চয়েস। আর আপনি যদি ফুচকা লাভার হন তাহলে ফুচকার টক জল আর প্রেমের জ্যামিতি এক্কেবারে অন্য ফিলিংস। এছাড়া দই-ফুচকা চুড়মুড় তো আছেই, দেখেই লালচ বেড়ে যাবে। আর বাকিটা জানতে হলে চেখে তো দেখতেই হবে...কী বলেন? তবে তার আগে ট্রেলার হিসাবে এটুকু জানিয়ে রাখি এখানের জাদু এমন যে আপনিও মোহিত হয়ে যাবেন।

শুধু ময়দান কেন ভিক্টোরিয়া থেকে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল অবধি একের পর এক জমাটি স্ট্রিট ফুড রয়েছে আপনার অপেক্ষায়। চিকেন মোমো থেকে ভ্যারাইটি স্যান্ডউইচ, ইডলি থেকে দই-বড়া, ধোসা টু চাউমিন যে কোনওরকম স্ন্যাক্সসহ দিব্যি পেটপুজোর আয়োজন। তবে এই চত্বরের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হল রং-বেরঙের শরবত উইথ আইস কিউব। আর আপনি যদি পিওর ফ্রুটজ্যুস পছন্দ করেন তাহলেও আপনার জন্য আছে লম্বা লিস্ট। সুদৃশ্য কাচের গ্লাসে পাইনআপেল থেকে অরেঞ্জ, ম্যাংগো থেকে মোসম্বি, আপেল থেকে গাজর, তরমুজ থেকে আঙুর— তাই চোখ বুজে পছন্দের ফ্লেভার হাতে তুলে নিন আর ঝটাকসে রিফ্রেশ হয়ে যান। তবে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় রং-বাহারি গোলা। সেই জিভ লাল ছোটবেলার স্কুলের দিনগুলো বেফিকর হয়ে উপভোগ করতে পারবেন। তবে ব্র্যান্ডের প্রতি ফ্যাসিনেশন থাকলে আপনার জন্য আছে কোয়ালিটি ওয়ালস থেকে আমুল সব রকমের আইসক্রিমের গাড়ি। সেখানে পাবেন করনেটো থেকে ম্যাগনাম, ভ্যানিলা থেকে বাটারস্কচ, চকোলেট থেকে টু ইন ওয়ান- তাহলে আর কী চাই! একেবারে শেষে পৌঁছে নট বাট দ্য লিস্ট একটা কনফেশান: যে নস্টালজিয়া আমাকে বারবার এখানে টেনে আনে তা হল ভিক্টোরিয়ার বাদামভাজা। ভিক্টোরিয়ার গার্ডেনে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে লেকের হাওয়ায় চুল উড়বে আর আপনি একটার পর একটা বাদামের খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরবেন— আহা, একেবারে সে এক অন্য ফ্লেভার। যারা এখনও এ স্বাদের ভাগ পাননি তাদের বলব অন্তত একবার ট্রাই করে দেখুন, বুঝতে পারবেন ভিক্টোরিয়ার বাদামভাজা ছাড়া কলকাতার টেস্ট কেন অধরা থেকে যায়...

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ জুলাই ২০১৭

সরকার স্টুডিওর সমাপন

শৈবাল পত্রনবীশ

শেষ পর্ব

বি এন সরকারের নিউ থিয়েটার্স নিয়ে অনেক লেখালিখি এবং আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু স্টুডিওর বিফলতা নিয়ে কেউ বিশেষ লেখেননি বা বলেননি। বিফলতার কারণগুলি নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। তারপর কানন দেবীর আত্মজীবনী 'সবারে আমি নমী' পড়ে অনেক কিছু জেনেছি। প্রথম কারণ হিসাবে বলা যায় অপরিমিত অর্থব্যয়। শুটিং হচ্ছে তো হচ্ছেই। ছবি তুলতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই এনজি হচ্ছে। সারাদিন ধরে লাইটিং-এর ফলে কোনও কোনওদিন নির্ধারিত শুটিংও বাতিল হয়ে যেত। অন্যান্য প্রোডাকশান হাউজগুলোতে একটি পরিমিত সময় ও অর্থব্যয় সবকিছু সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখানে খরচের কোনও হিসাব থাকত না। ফলত সরকার সাহেব অর্থব্যয়ের উপর রাশ টানতে পারেননি। এই স্টুডিওর ইতিহাসে প্রথম বিপর্যয় আসে ১৯৪৩ সালের ৯ আগস্ট। সেটি ছিল বি এন সরকারের জীবনে একটি মর্মান্তিক দিন। স্টুডিওতে এক অগ্নিকাণ্ডের কারণে নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে নির্মিত বিভিন্ন ছবির নেগেটিভ ছাই হয়ে যায়। যার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত 'নটীর পূজা' ছবির প্রিন্ট।

এই ধ্বংসলীলায় স্টুডিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁরা মাস মাইনের কর্মচারী ছিলেন তাঁদের সরকার সাহেব নিয়মিত মাইনে দিয়ে যেতে থাকলেন। এ ধরনের অনেক কারণের জন্যই স্টুডিওর অর্থভাণ্ডারে টান পরে গেল। সরকার সাহেব এককভাবে স্টুডিওর দায়িত্ব সামলাতেন। কিন্তু, সেখানকার অবস্থা যখন মধ্যগগনে, তখন কোনও ট্রাস্ট গঠন করেননি যাতে প্রয়োজনে ট্রাস্টের সম্মিলিত প্রয়াসে এবং সাহায্যে অর্থ বাঁচিয়ে স্টুডিওর অবস্থা ফেরানো যেত। সরকার সাহেব যদি ব্যবসার সঙ্গে উদারতাকে এক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখতেন, তাহলে হয়তো অনেক টাকাই সাশ্রয় হতো।

সপরিবারে বি এন সরকার

এরপর এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কলকাতার উত্তরাঞ্চলে জাপানি বোমা পড়ল। দেশজুড়ে শুরু হল অস্থিরতা। অনেকেই সেই সময় কলকাতার বাইরে চলে গেলেন। তারপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে অনেক সিনেমাহলই বন্ধ করে দেওয়া হল। চলচ্চিত্র ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল। ছবির প্রোডাকশনও বন্ধ হয়ে গেল। একটা সময় ছিল যখন নিউ থিয়েটার্সের কোনও চেক ব্যাংকে জমা না দিয়েও শহরের বড় বড় দোকান থেকে ভাঙিয়ে নেওয়া যেত। শুধু চেকের পাতায় স্টুডিওর নাম থাকলে চলে যেত। এক সময় উর্দু ছবির সমৃদ্ধির জন্য বীরেন্দ্রনাথ অবিভক্ত ভারতের লাহোর শহরে কলকাতার মতো আরও একটি অত্যাধুনিক স্টুডিও করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়ান ফিল্ম ল্যাবরেটারি'। দেশভাগের পর সেই স্টুডিওটিও বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু কালের নিয়মে সেই যুগেরও পরিবর্তন ঘটল। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, যিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের রূপকার তিনি মাত্র পঁচিশ বছর এই মাধ্যমটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর নিজেকে ছবির জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে নেন। বি এন সরকারের মহানুভবতা, চূড়ান্ত আর্থিক অপচয়, ল্যাবরেটরির অগ্নিকাণ্ড, যুদ্ধ ও দাঙ্গার কারণে ছায়াছবির বাজার মন্দা হয়ে যায়, তার ফলে সরকার সাহেবের সমস্ত প্রচেষ্টাই অসফলতার মুখ দেখে। পরবর্তীকালে বি এন সরকারের পুত্র দীলিপ সরকার ও তাঁর কাকিমা মীরা সরকার তৈরি করেন নিউ থিয়েটার্স এগজিবিটার্স প্রাইভেট লিমিটেড। এঁদের ব্যানারে সেই সময় বহু জনপ্রিয় ছবি তৈরি হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল 'নির্জন সৈকতে', 'শেষরক্ষা', 'নতুন ফসল', 'অজানা শপথ' ইত্যাদি। ছবিগুলি দীর্ঘদিন বাজারে চলেওছিল। কিন্তু নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর স্বর্ণযুগ আর ফিরে আসেনি।

বেতারের নিজস্ব মুখপত্র 'বেতার জগৎ'

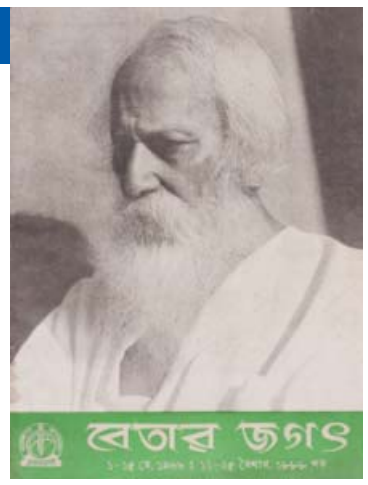

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব-আট

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে আলো। নিকষ কালো ভেদ করে আলোর ঝলকানির সঙ্গে তীব্র শব্দ। নাহ্, আজ আর রেডিও শোনা যাবে না। মনটা খারাপ লাগছে ঠাকুমার। আসলে রেডিওর জন্মলগ্ন থেকে না হলেও সেই ১৯৪৪ সাল থেকেই ওই একটিমাত্র বস্তু যা ঠাকুমাকে ছেড়ে যায়নি। আজ ৭৫ বছরেও, আধুনিক শৈলীর রেডিও অনুষ্ঠানও তাঁকে টানে। ঠাকুমার কাছেই শুনেছি এক সময় রেডিও বন্ধের আভাস, লাইসেন্স ফি, 'বেতার জগৎ' এমনই আরও কত কী! আজকের বেতার কথায় সেইসব কথা।

১৯২৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জন্ম নিল 'বেতার জগৎ'। মূলত বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচী জানাতেই এই পত্রিকার জন্ম। পাক্ষিক এই পত্রিকার প্রথমবর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় দেখা গেল একটি ছোট বিজ্ঞাপন— 'বিনা লাইসেন্সে রেডিও সেট ব্যবহার করার অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে, এ সংবাদ আমরা গত সংখ্যায় বেতার জগৎ মারফৎ সাধারণকে জানিয়েছি। ...যাঁরা এখনো বিনা লাইসেন্সে সেট ব্যবহার করেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে এই বেলা লাইসেন্স নিয়ে ফেলুন। নচেৎ তাঁদের ভবিষ্যতে দুঃখিত হতে হবে...।' এই বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায় সেই সময় বেতারের শ্রোতাদের থেকে বার্ষিক লাইসেন্স ফি নেওয়া হতো। আসলে বেতার সম্প্রচারের ব্যয়ভার এই টাকা থেকে কিছুটা সুরাহা হতো। তার থেকেও যে ব্যাপারটিতে সাহায্য হতো, সেটি হল সরাসরি শ্রোতাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের অভিমত পাওয়া যেত। বর্তমানে যদিও এই প্রথা আর নেই।

১৯৩০ সালের প্রথমদিকে, (তখন বেতারের নাম ছিল ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি) বিপুল অর্থসংকটের মুখে পড়ে। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন, বেতার বন্ধ করে দেওয়া হবে। অথচ তখন সাধারণ মানুষের বিনোদনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে বেতার একটি জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু মুশকিল হল, কর্তৃপক্ষের নেওয়া এই সিদ্ধান্ত শ্রোতাদের কাছে ফাঁস হয়ে পড়ে।

ওই বছর ফেব্রুয়ারির বেতার জগৎ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকের উদ্দেশে লেখা শ্রীবাঞ্ছারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, বেতার বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলত যাঁরা সদ্য লাইসেন্স করিয়েছেন, তাঁদের খুব লোকসান হল। চিঠিটি কিছুটা উদ্ধৃত করছি, 'মশাই, শুনলাম নাকি আপনাদের বেতার উঠে যাচ্ছে। খুব লোকসান যা হোক, মশাই। এই সবে দিন পনেরো লাইসেন্স করেছি।...ভাবলুম বাড়িতে ফিরে এসে সন্ধেবেলাটা একটু আরাম করব, পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে বেতার শোনাব...এখন কী হবে মশাই?' এই চিঠিতে 'মহিলা মজলিশ', 'গল্পদাদা' এই অনুষ্ঠানের নামও পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানগুলির জন্য বাড়ির লোকজনেরা অপেক্ষা করে বসে থাকেন। তার কী হবে? তবে শেষমেষ, বেতার বন্ধ হয়নি। এই খবরও বেরিয়েছিল বেতার জগৎ পত্রিকায়। 'গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে, কলিকাতা ও বোম্বাই-এর স্টেশন থেকে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে

অনুষ্ঠানগুলি প্রচারিত হবে। একদিনের জন্যও বন্ধ হবে না।' আমরা জানি ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে বেতার সম্প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারত সরকার। নাম হয় 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'।

আগেই বলেছি এই বেতার জগতের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, আর সেই অর্থে এর মৃত্যু ১৯৮৬ সালের ১৫ জানুয়ারি। অর্থাৎ এর জীবনকাল ৫৬ বছর ৩ মাস ১৯ দিন। এই সময়সীমায় তার কত না লড়াই, কত না সুখস্মৃতি। এবার একটু চোখ রাখি সেইদিকে। মূলত বেতারের অনুষ্ঠানের আগাম খবর জানানো হতো এই পাক্ষিক পত্রিকায়। এছাড়াও থাকত বেতারে প্রচারিত কথিকা, গল্প, সাক্ষাৎকার, সমীক্ষা। জানা যাচ্ছে, বেতার অনুষ্ঠানের প্রোপাগান্ডার জন্যই এই পত্রিকার ভাবনা। প্রতি মাসের ১ ও ১৬ তারিখে এই পত্রিকা প্রকাশিত হতো। দাম ছিল দুই আনা। বার্ষিক গ্রাহকদের 'ম্যানেজার, বেতার জগৎ' এই নামে ২ টাকা মূল্য পাঠাতে হতো। বিশেষ সংখ্যার দাম বেশি হলে, বার্ষিক গ্রাহকদের অধিক মূল্য দিতে হতো না। সঠিক সময়ে পত্রিকাটি না পেলে ডাকবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ থাকত। ডাকবিভাগের অনুসন্ধান বেতার কেন্দ্রে জানালে পুনরায় সেই সংখ্যাটি গ্রাহককে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হত। সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী 'বেতার জগৎ' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন। বেতন পেতেন মাসিক ৫০ টাকা। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, কার্যত প্রেমাঙ্কুরবাবু সম্পাদক হলেও ছাপা হতো নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের নামে। পরবর্তীতে যখন সিদ্ধান্ত হয় স্টেশন ডিরেক্টরের নামেই সম্পাদকের নাম ছাপতে হবে, তখন সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হতো জে.আর স্টেপলটন। স্বাধীনতার পর, যিনি সম্পাদক ছিলেন তাঁর নামই যেত।

১৯২৯ সালে 'বেতার জগৎ'-এর প্রথম সংখ্যা ছাপা হয় সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কান্তিক প্রেস থেকে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী নিউ থিয়েটার্সে যুক্ত হলে সেই স্থানে আসেন নলিনীকান্ত সরকার। অনুষ্ঠানসূচীর পাশাপাশি থাকত বিশেষ প্রবন্ধও। প্রকাশিত হত বিশেষ সংখ্যাও। যেমন, রবীন্দ্র সংখ্যা, নেতাজী সংখ্যা, শারদীয়া সংখ্যা। আজকের মতো প্রিন্টিং টেকনোলজি না থাকায় হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত বদলালে সমস্যা হতো। ১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে এমনই এক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল। সম্রাট পঞ্চম জর্জের দেহাবসান হয়েছে ২৬ তারিখ। সেই সময় ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষের বেতার জগৎ প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। হাতে মাত্র ৪-৫ দিন। নলিনীকান্ত সরকার লিখছেন, 'বন্ধুবর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সংখ্যার বেতার জগৎ বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশ করবার জন্যে উদ্যোগী হলাম। বীরেন্দ্র ভদ্র ছুটলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, (এখনকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি)। সেখান থেকে খান দুই মোটা মোটা বই নিয়ে এলেন। ...বীরেনবাবু লিখতে বসলেন। আমি ছুটলাম ছাপাখানায়। ছুটলাম ব্লকমেকারের কাছে। ...উৎসাহ দিলেন তাঁরা। ...সকলের সহযোগিতা পাওয়ায় যথাসময়ে পঞ্চম জর্জ সংখ্যা বেতার জগৎ বেরিয়ে গেল।' এইরকমই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৪ সালের ২৭ মে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে। নির্ধারিত কিছু লেখা বাদ দিয়ে, নেহরু-সম্বন্ধীয় লেখায় সম্বৃদ্ধ 'জওহরলাল নেহরু সংখ্যা' যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। আসলে বিষয়ের গুরুত্ব বোঝার বোধ, পড়াশোনা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা— এই তিনের সংযোগ প্রকৃত অর্থেই ছিল বলে বেতার জগৎ এত জনপ্রিয় হয়েছিল। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আজ অনেক সম্পাদকেরই সেই বোধ-বুদ্ধি, পড়াশোনা কোনওটাই নেই।

১৯৪৪-এর ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদকের পদ পালন করে নিয়মানুযায়ী অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পি বি রায়, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ রায়, সুভাষ বসু, অসীম সোম প্রমুখ নাম উঠে এসেছে বেতার জগৎ-এর সফল সম্পাদক রূপে। ট্রান্সজিস্টার রেডিও বেরোনোর পর দ্রুত বাড়ে রেডিওর শ্রোতার সংখ্যা, আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বারে বেতার জগতের প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন। একসময় বেতার জগতের মুদ্রণ সংখ্যা সমসাময়িক পত্রসমূহের শীর্ষে পৌঁছয়।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, শুধুই কি বাংলা ভাষায় বেতার জগৎ নাকি অন্য ভাষাতেও প্রকাশিত হতো? এর উত্তর যে হ্যাঁ সে আপনারা সবাই জানেন। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিতেই দেখা গেছে ফেলুদাকে বেতার অনুষ্ঠানসূচির সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা হাতে, যেখান থেকে তিনি খুঁজে পান গণেশ রহস্যের অন্যতম এক সূত্র। বেতার জগৎ প্রকাশের আগে মুম্বই থেকে প্রকাশিত হয় 'ইন্ডিয়ান রেডিও টাইমস' যার পরবর্তীতে নাম হয় 'দ্য ইন্ডিয়ান লিসনার'। ১৯৩৮ সালে হিন্দি মুখপত্রের নাম 'আওয়াজ' থেকে পরিবর্তন করে রাখা হয় 'সারঙ'। উর্দু মুখপত্রের নাম 'আওয়াজ'-ই থাকে। ১৯৫৮ সালে 'দ্য ইন্ডিয়ান লিসনার' ও 'সারঙ' এই দুইয়ের নাম হয় 'আকাশবাণী'। তবে 'বেতার জগৎ' নামটি কোনওদিন পরিবর্তিত হয়নি। অসমিয়া মুখপত্রটির নাম ছিল 'আকাশী'।

এই বেতার জগৎ থেকে তখনকার বিজ্ঞাপনের ভাষার নানা পরিচয় ও শৈলীর সন্ধান পাওয়া যায়। সেই বিজ্ঞাপন নিয়ে অন্য সংখ্যায় কলম ধরব।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ জুলাই ২০১৭

অশরীরী @ কলকাতা

কিছুটা হেঁটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়

সোমনাথ আদক ও সৌরভ মণ্ডল

বিশ্বাস আর তর্কের সম্পর্ক খানিকটা আদায় কাঁচকলার মতো। বিশ্বাস যেখানে আদ্যোপান্ত আস্তানা গেড়ে আছে সেখানে যত তর্কই হোক না কেন কোনও পক্ষই হার মানতে নারাজ। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মানুষ যতই বিজ্ঞানমনস্ক হোক; ভূত, অশরীরী বা প্যারানরমাল অ্যাকটিভিটি নিয়ে মানুষের আলাপ-আলোচনা কিন্তু থেমে থাকেনি। সে হতে পারে ভয়ের, হতে পারে স্নায়বিক উত্তেজনার কিংবা এন্টারটেনমেন্টের খোরাক। যাই বলুন এই ভূত ব্যাপারটার উন্মাদনা কিন্তু কমেনি।

সারা কলকাতা শহর জুড়ে ঘুরে বেড়ায় অশরীরীদের নিয়ে কতসব গল্প। কিছু জায়গা ট্রেডমার্ক পেয়ে যায় হন্টেড প্লেসের। আদতে তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই 'যা রটে তার কিছু তো ঘটেই' তাহলে ভাববার বিষয় এই শহরের আনাচে-কানাচে মানুষের মতই 'তেনাদের'ও হয়তো সোসাইটি আছে। আছে ট্রেড ইউনিয়ন। জিএসটি নামক বস্তুটি নিয়ে তারাও কি খানিকটা সোরগোলে?

যাই হোক না কেন কলকাতার শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে থাকা এমনি একটি জায়গা হল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড ও চারুচন্দ্র অ্যাভিনিউ-এর সংযোগস্থলে, টালিগঞ্জ রেল স্টেশনের পাশে অবস্থিত শহর কলকাতার ব্যস্ততম মেট্রো স্টেশন, রবীন্দ্র সরবোর। হ্যাঁ, এখানে যেন প্রতিটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে অজানা এক মৃত্যুর সংকেত।

শোনা যায়, আত্মহত্যার ভূত মাথায় চাপলেই নাকি রবীন্দ্র সরবোর মেট্রো হাতছানি দিয়ে ডাকে। মাটির নীচে মেট্রোর লাইনের ৪০০০ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ যেন সম্মোহিত করে। জানা যায় কলকাতার মেট্রো স্টেশনগুলোতে যত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে তার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশই ঘটেছে এই স্টেশনে। দিনের বেলা এখানে ভূতের কোনও আভাস পাওয়া না গেলেও যাঁরা শেষ মেট্রোতে যাতায়াত করেন তারা অনেকেই নাকি অদ্ভুত সব শব্দ শুনেছেন। কেউ কেউ আবার ছায়ামূর্তিও দেখেছেন। রাত সাড়ে দশটার শেষ মেট্রোয় অনেক চালক ও যাত্রী নাকি ছায়ার মতো বিভিন্ন মূর্তিকে রেললাইন দিয়ে কিছুটা হেঁটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছেন। একবার এক শনিবার রবীন্দ্র সরবোর মেট্রো স্টেশনে ট্রেন ঢোকার পর পরই নাকি সাদা শাড়ি পরা এক মহিলাকে ঘুরতে দেখা যায়। যদিও নিজের চোখে কেউ ঘুরতে দেখেননি ওই মহিলাকে। তবে স্টেশনের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই মহিলার ছবি। আর সেই ছবি প্রকাশ পেতেই তা ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার পরেই শুরু হয় একের পর এক জল্পনা। কেউ বলছেন রবীন্দ্র সরবোর মেট্রো স্টেশনে এর আগেও নাকি অনেকের গা ছমছম করেছে। বেশি রাতে ওই স্টেশনে নামতে অনেকেই ভয় পেয়েছেন। এবার আর একটি ঘটনার কথা বলি, ৮ই মার্চ, মঙ্গলবার ২০১৫। ডাউন মেট্রো সাড়ে দশটা। ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ পাশের নিত্য যাত্রীটির সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় মেতে আছেন, কারও আবার চোখ দুটো সামান্য লেগে এসেছে। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দুটো স্টেশনের মাঝখানে ট্রেনটা থেমে গেল। কী হয়েছে কী হয়েছে ভয়ে কৌতূহলে যাত্রীদের চোখ তখন কপালে। মেট্রো চালকের চোখ ছানাবড়া। হৃদপিণ্ডটা তার সমস্ত ধুকপুকুনি নিয়ে যেন গলার কাছে উঠে এসে আটকে গেছে। ট্রেন থামিয়ে দু'হাতে চোখ কচলে তিনি তখন দেখছেন, সুরঙ্গের ভেতর অন্ধকার লাইনের ওপর দিয়ে কে যেন হেঁটে যাচ্ছে। এই ঘটনার ফুটেজ সিসিটিভি-তে ধরা না পড়লেও অনেক ট্রেন চালক এবং যাত্রীদের বিশ্বাস 'তেনারা' এখানে আছেন। না হলে বাস্তবে যে লাইনের ওপর সব সময় ৪০০০ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ চলাচল করে সেই লাইনের ওপর দিয়ে কখনও কোন মানুষ হাঁটতে পারে! এমনি আরও কত ঘটনা যার সত্যতা বা অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাতুলতা। তবে এ প্রশ্নটা কিন্তু অমূলক নয়-'তেনারা' কি সত্যিই আছেন? অনেকেই বলেন তাদের না দেখলেও অস্তিত্ব কিন্তু তারা টের পেয়েছেন।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

গঙ্গার ঘাট @ কলকাতা

কাশী মিত্র ঘাট থেকে বাগবাজার ঘাট

নীহারিকা

পবিত্র স্রোতস্বিনী হুগলি নদী আর একদিকে শহরের মৃৎশিল্পের পীঠস্থান কুমোরটুলির প্রান্তিক সীমানা এবং অদূরে গোকুল মিত্রের মদনমোহন। এছাড়া চক্ররেলের লাইন তো আছেই। এসবের মধ্য দিয়েই গঙ্গা বরাবর সোজা এগোলেই কাশী মিত্র শ্মশানঘাট। কলকাতার অন্যতম পরিচিত দাহকার্যের ঘাট এটি। ১৭৭৪ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। পরে ১৮২৩-'২৭ সালের মধ্যে গঙ্গা বরাবর যখন স্ট্র্যান্ড রোড তৈরি হয় সেই সময় শ্মশানের জায়গা পরিবর্তন করা হয়, যাঁর নামে জায়গাটির অথবা ঘাটটির নামকরণ করা হয়েছে তিনি ছিলেন ১৮৩০ শতকে কলকাতায় বসবাসকারী একজন ক্ষমতাসম্পন্ন বিত্তবান নাগরিক। চারবার পাণিগ্রহণ করলেও তাঁর নিজস্ব কোনও সন্তানাদি ছিল না। সেই কারণেই হয়তো বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে তিনি নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেছিলেন। জনকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা ছাড়াও গঙ্গা-সংলগ্ন কয়েকটি ঘাটও তিনি নির্মাণ করান। সেগুলোর অন্যতম কাশী মিত্র ঘাট। যে যুগে এটি নির্মাণ করা হয়, তখন উত্তর কলকাতায় দাহকার্য সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত কোনও শ্মশানঘাট ছিল না। বাংলা সাহিত্যের নবীন প্রতিভা সুকান্ত ভট্টাচার্যের দাহকার্য এখানেই করা হয়।

আবার এগোনোর পালা। আবার নতুন কোনও ঘাট, আবার অজানা ইতিহাস। এরপর তালিকায় যুক্ত হল গোলাবাড়ি ও হাটখোলা ঘাট। অতীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণেই প্রধানত ঘাট দুটি ব্যবহার করা হতো। এটি নির্মাণ করান শোভাবাজারের তৎকালীন দেওয়ান নন্দরাম সেন। ১৮৫৬ সাল থেকে এই ঘাটের ব্যবহার শুরু হয়। সেই ঘাটে মহাজনি নৌকার আনাগোনা ছাড়াও মৃত গবাদি পশুর দেহ এই ঘাট থেকেই জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। এর পাশ দিয়েই ১৮৬৭ সালে বসানো হয় মিউনিসিপ্যাল রেলওয়ের লাইন, আরও পরে ঘাটটি বিক্রয় করে দেওয়া হয় ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টের কাছে ১৮৭৪ সালে। এবারে ঘাটের সঙ্গে রাজবৃত্তান্তের কথা শোনাই। রাজার বাড়ি, রাজার দরবার, রাজার হাতিশাল, ঘোড়াশালের কথা আমরা সবাই শুনেছি, কিন্তু আমরা কি জানি রাজার ঘাটের কথা? হ্যাঁ, এই শহরেই আছে রাজার ঘাট। স্থানীয় মানুষের কাছে ঘাটটি এই নামেই পরিচিত। এর আরেক নাম রাজা নবকৃষ্ণের ঘাট। কথিত আছে, শোভাবাজার রাজ পরিবারের পত্তন তাঁর হাতেই। রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন রুক্মিণী দেবীর প্রপৌত্র। অন্যদিকে তিনি ছিলেন বেহালা-সংলগ্ন বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীর এস্টেটের ম্যানেজার। ইতিহাস বলে, এই ঘাটের নির্মাতা রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর। তিনিও থাকতেন শোভাবাজারে। শোনা যায় এই রাজ পরিবারের কেউ মারা গেলে রাজার ঘাট-সংলগ্ন পরিবারের নিজস্ব শ্মশান ঘাটে তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এর প্রায় কাছেই বাগবাজারের বিচালি ঘাট ও ফেরিঘাট। এই ফেরিঘাট থেকে কলকাতা ও হাওড়ার অন্যান্য ঘাটে যাবার জন্য জল পরিবহনের সুবন্দোবস্ত আছে। ঘাটের ডানদিকেই রয়েছে বাগবাজার স্টেশন। এছাড়া শ্রীশ্রীলোকনাথবাবার মন্দির এবং বাগবাজার গঙ্গাতীর ভাগবত সভা।

আরও কিছুটা হেঁটে গেলে মা সারদার ঘাট। বাগবাজারে থাকার সময় মা এই ঘাটেই আসতেন স্নানের জন্য। আগামী পর্বে সেই মায়ের ঘাট এবং তারই সঙ্গে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘাটের কথা জানাব।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৭ জুলাই ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

চোখ বুজলেই যার স্পর্শ প্রতিনিয়ত পাওয়া যায়

হাসান হালিম (সমাজকর্মী)

কলকাতা মানে সত্যিই একটা প্রাণোচ্ছল শহর। 'সিটি অব জয়' নামটা কোথাও যেন সার্থক। অন্তত আমার চারদিনের কলকাতা ভ্রমণ আমাকে সেই অভিজ্ঞতাই দিয়েছে। আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন আমাদের রাজশাহি থেকে ঢাকা সর্বত্রই কলকাতার কালচার, কলকাতার স্টাইল ছিল একটা অন্যতম আলোচ্য বিষয়। তাই আকর্ষণ একটা ছিলই এই শহরকে কাছ থেকে দেখার।

আমার চৌত্রিশ বছরের জীবনে অনেক দেশেই ঘুরেছি। জাপান বা সিঙ্গাপুরে কাজের ব্যাপারে মাঝেমধ্যেই যেতে হয়। তবে কলকাতাই এমন একটা শহর যেখানে আমি নিজের মাটির গন্ধ পাই। মনে হয় এ-শহর তো আমার ঢাকা বা রাজশাহির চেয়ে আলাদা কিছু নয়। কলকাতার ভাষা-সংস্কৃতির সাথে তো আমাদের ফারাক সামান্যই।

২০১০ সালে প্রথম আমার কলকাতা যাওয়া মূলত একটা কাজেই, তবে হাতে দুদিন সময় বেশি নিয়ে গেছিলাম শহরটাকে একটু নিজের মতো করে দেখব বলে। শিয়ালদহের কাছে একটা হোটেলে উঠলাম। নাম ক্যালকাটা লজ। সেই সফরে আমার সঙ্গী ছিল দুই ভাই— জাফর আর সোহেল। আমার কয়েকটা জায়গা প্রথম থেকেই নোট করা ছিল সেখানে আমি যাবই। গেলামও তার কয়েকটাতে। প্রথমদিন চলে গেল কাজ মেটাতে পরের তিনদিন শুধুই কলকাতা শহরটাকে ঘুরে দেখা।

হোটেল থেকে সকালে বেরিয়ে বাস ধরে সোজা সায়েন্স সিটি। সে এক অন্যরকম জগৎ। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। এই কলকাতার প্রায় এক বিচ্ছিন্ন প্রান্তে এর অবস্থান। একে না দেখলে কলকাতার অনেক কিছুই দেখা হয় না। সেখান থেকে সোজা ট্যাক্সি ধরে চলে গেলাম রবীন্দ্রসদন। অনেকের মুখে শুনেছিলাম এই জায়গার পরিবেশটাই অন্যরকম। নিজের চোখে দেখলামও তাই। ভাইয়েদের নন্দন সিনেমা হলে একটা সিনেমা দেখার প্ল্যান ছিল সেটাও হল। আমার মনে হয় কলকাতার বুকে এরকম জায়গা আছে বলেই কলকাতার মেদুরতা এত বেশি। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী সবার সন্ধের আড্ডা সেখানে। পরিবেশটাও কেমন যেন আড্ডা আড্ডা মেজাজের। আমরা অনেক রাত অবধিই ছিলাম সেদিন। অনেকের সাথে আলাপ-পরিচয়ও হচ্ছিল। তারপর সেদিনের মতো হোটেলে ফিরলাম। পরের দিন ওই চত্বরের ভিক্টোরিয়া আর বিড়লা তারামণ্ডলটা দেখতে গেলাম। আসলে ভিক্টোরিয়ার কথা যত লিখব শব্দ কম পড়ে যাবে। এ যেন শহর কলকাতার অক্সিজেনের উৎস। তারামণ্ডলও খুবই আকর্ষণীয় জায়গা। কলকাতার আর যেটা মনে পড়ে সেটা হল শান্ত স্নিগ্ধ গঙ্গার ঘাট। প্রিন্সেপ ঘাটে বসে অদ্ভুত সুন্দর এক অনুভূতি পেয়েছি। আর যেগুলো মনে পড়ে কলকাতার তা হল জাদুঘর, নিউমার্কেট। আমরা জাদুঘর হয়ে মার্কেটিং করতে যাই নিউমার্কেটে। এ এক বড়-ছোটর খুব সুন্দর মেলবন্ধন। বড় দোকান যেমন আছে, শপিং মলগুলো যেমন আছে তেমনি আছে ফুটপাতের দোকানদাররা। তাদের কালেকশনও চোখে তাক লাগানোর মতোই। একটা অদ্ভুত ঘটনা হল তিনদিন রাত কাটাচ্ছি শিয়ালদহে অথচ একবারের জন্যও কলেজ স্ট্রিটে যাওয়া হয়নি। দেখা হয়নি মান্না দে-র কফি হাউসকে। চলে গেলাম পরের দিন বিপুল বইয়ের সাম্রাজ্যকে সামনে থেক দেখলাম। কিনলামও বেশ কিছু বই।

ফেরবার আগের রাতে বারবার মনে হচ্ছিল আর দুটো দিন থাকতে পারলে বোধ হয় ভালো হতো। তবে ওই যে জীবন-জীবিকা আর সংসারের টান বড় অদ্ভুত বাঁধন। তবে কিছু জিনিস তো থেকে যায়। জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত কাটে, চোখ বুজলেই যার স্পর্শ প্রতিনিয়ত পাওয়া যায়; কলকাতা এমন অনেক মুহূর্ত আমায় উপহার দিয়েছে।

ফোটো: প্রীতম চক্রবর্তী

বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞানী প্রিয়দারঞ্জন রায়

অচিন্ত্যকুমার মাইতি

যাঁকে এক শ্রেণির লোক বলে থাকেন বিজ্ঞানী, আর এক শ্রেণির লোক তাঁকে অ্যাখ্যা দিয়েছেন দার্শনিক, জীবনসংগ্রামে অনড় থেকে যিনি প্রায় অন্ধ অবস্থাতে নিজের গবেষণা চালিয়ে গিয়ে সফল হয়েছেন, এহেন বঙ্গসন্তান হলেন বিজ্ঞানী প্রিয়দারঞ্জন রায়। প্রিয়দারঞ্জন বর্তমান বাংলাদেশের (অবিভক্ত বঙ্গের) চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে ১৬ জানুয়ারি, ১৮৮৮ সালে জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালীচরণ রায় কর্মসূত্রে সাব-ডেপুটি কালেকটরের পদে আসীন ছিলেন। প্রিয়দারঞ্জন ছিলেন কালীচরণ-শ্যামাসুন্দরীর তৃতীয় পুত্র। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী। স্কুলজীবন শুরু হয় গ্রামের বিদ্যালয়ে। ১৯০৪ সালে চিটাগং কলেজিয়েট স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় থেকেই তিনি বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে থাকেন। চিটাগং গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় মেরিট স্কলারশিপ নিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করে কলকাতায় চলে এলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা উভয় বিষয় অনার্স নিয়ে বিএ-তে ভর্তি হন। সে-সময় বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার জন্য বিএসসি ক্লাস খোলা হয়নি। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অন্যতম পীঠস্থান। প্রথিতযশা অধ্যাপকমণ্ডলীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ আলো করে আছেন—রসায়নে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পদার্থবিদ্যায় আচার্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যক্ষ হিসাবে বিখ্যাত পার্সিভাল সাহেব। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আর্কষণ করেন এবং আচার্য রায়ের অত্যন্ত স্নেহধন্য হয়ে ওঠেন। রসায়নে উল্লেখযোগ্য ফল করে আচার্য রায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রসায়ন নিয়ে এমএ-তে ভর্তি হলেন। ১৯১১ সালে এমএ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন।

এমএ পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর প্রিয়দারঞ্জন রসায়নে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। আচার্য রায়ের অধীনে তিনি অজৈব রসায়নে গবেষণা শুরু করলেন। এদিকে একটি অঘটন ঘটে গেল। গবেষণাগারে গবেষণা করতে করতে ১২ আগস্ট, ১৯১২ সালে প্রিয়দারঞ্জন একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ফলে বাঁ চোখটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল আর ডান চোখটি কোনওক্রমে রক্ষা পেল বটে, কিন্তু অস্পষ্ট। এই অস্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে উচ্চতর গবেষণা চালিয়ে গেলেন, দু'বছরের বেশি গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯১৪ সালে কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক পদে যোগদানে। এখানে টানা ৪ বছর অধ্যাপনার পর ১৯১৭ সালে নবনির্মিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হলেন এবং আবার গবেষণা শুরু করেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি বিজ্ঞান কলেজকে নতুন কলেবরে সাজান। স্যার আশুতোষের উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং সি ভি রামন যথাক্রমে রসায়নে এবং পদার্থবিদ্যায় প্রথম পালিত অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন।

অল্প সময়ের মধ্যে বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রিয়দারঞ্জনের কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। দেশ-বিদেশ থেকে অজস্র প্রশংসা পেলেন। ১৯২৯ সালে প্রিয়দারঞ্জন বিদেশে পাড়ি দেন। বিদেশে তিনি বিখ্যাত বিখ্যাত রসায়নবিদের সান্নিধ্যে আসেন— তাঁদের মধ্যে হলেন বিজ্ঞানী ফিস এফ্রাইম, বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক এমিচ প্রমুখ। ১৯৩২ সালে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি হন প্রিয়দারঞ্জন। এই অধিবেশনে তিনি যৌগিক পদার্থের আণবিক সংগঠন ও যোজ্যতা' তত্ত্ব বিষয়ে যে যুগান্তকারী বক্তৃতা দেন তা রসায়ন বিজ্ঞানীমহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি বিভিন্ন সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৪৭ সালে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি, ১৯৫১ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অন্যতম নির্বাচিত সদস্য, ১৯৫৮-৫৯ বর্ষে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটির সহসভাপতি। ১৯৫২ সালে বিজ্ঞান কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর অবৈতনিক অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং এর ডিরেক্টর পদে আসীন ছিলেন।

বিজ্ঞান সাধনার সাথে সাথে তিনি বাংলাভাষার চর্চা করে গেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি বিজ্ঞান, জীবন ও দর্শন নিয়ে লিখেছেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত বাংলাগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ', 'রসায়ন ও সভ্যতা', 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি', 'বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম' প্রভৃতি।

১১ ডিসেম্বর ১৯৮২তে এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান ঘটে। ব্যক্তিগত জীবনে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্রিয়দারঞ্জন ছিলেন উদার-মহপ্রাণ, নির্লোভ, বিনয়ী, শিক্ষাব্রতী ও মানবদরদী। বাংলার বিজ্ঞানেতিহাসে আজ তিনি বিস্মৃতপ্রায়।